A Peer-Reviewed Article
ISSN: 3136-9049
eISSN: 3136-9057

North Bengal International University Journal
https://journal.nbiu.edu.bd

অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বিনির্মাণে মদীনার সনদ : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

The Medina Charter in the Creation of a Non Secular State: A Historical Analysis

Mohammad Azibar Rahman*

Abstract

Hazrat Muhammad (sm.) founded the first Islamic state in Medina. This was the first effective step in the formation of a non-secular state in world history. Through the signing of the Medina Charter, the outline of peaceful coexistence of Muslims, non-Muslims, Jews, immigrants, people of all classes and professions in the same state, regardless of nation, religion, caste-gender, was presented to the world. Previous prophets and messengers were sent to specific regions or communities. But Allah Almighty sent Prophet Muhammad (sm.) as a mercy for the entire world. In the ignorance, he appeared before the people with a torch of light. He founded the formal journey of the Islamic state in Medina 1400 years ago with a great vow to establish peace in the turbulent world. He formulated the Charter of Medina to govern the newly formed state, which is a guide for future statesmen. The Medina Charter is very relevant to us in creating bonds of compassion, harmony and cordiality in the current conflict-ridden world. Analytical and descriptive methods have been followed in the formulation of this paper.

Keywords: Medina, Charter, State, Non-Secular, Justice, Islam, Community.

ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে ৩০০ মাইল উত্তরে ইয়াসরীবে[১] হিজরত করেন।[২] হিজরতের পর ইয়াসরীব শহর ‘মদীনাতুন্নবী’ বা নবীর শহর নামকরণ

---

*Associate Professor, Islamic History and Culture, North Bengal International University, Rajshahi, Bangladesh.

হয়, যা পরবর্তীতে 'মদীনা' নামে পরিচিতি পায়।[৩] মদীনাতে বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।[৪] মদীনা নবগঠিত রাষ্ট্রের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে এবং কালক্রমে বিপুল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হিজরতের তৃতীয় বর্ষে রবিউল আউয়াল মাসে সেখানে বসবাসরত মুসলিম, পৌত্তলিক, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে যে ঐহিাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' (Charter of Medina) বা কিতাব আল মদীনা (Sahifat al-Madina) হিসেবে প্রসিদ্ধ।[৫] এ সনদকে প্রতিজ্ঞাপত্র (Pact) বা আন্তর্জাতিক সনদ (International Magnacharta)ও বলা হয়।[৬] এর মাধ্যমে মদীনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সকলকে নিয়ে এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা তৎকালীন গোত্রপ্রথার বিলোপ সাধন করে। এতে প্রথমে মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলমানদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সত্ত্বাধিকার ও তাদের সমাজগত বিষয়গুলোর শাসন ও বিচারের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর পৌত্তলিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। মদীনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তর ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে। ঐতিহাসিক এ সনদ বিশ্বের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র (First Written Constitution) বা সংবিধান।[৭] বহু ধর্ম-বর্ণ ও বহুগোষ্ঠীভূক্ত সমাজকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুপূর্ণ পদক্ষেপ। এ চুক্তির মধ্যদিয়ে একটি মিশ্রিত জণগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের ফেডারেশন তৈরি হয়, যা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থারই প্রতিভূ। আধুনিক বিশ্বে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বিনির্মাণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক সমতা আনয়নে মদীনার সনদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রবন্ধটিতে এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রথম হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসের চাঁদনী রাত মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা থেকে ৪৪৫ কিলোমিটার দূরবর্তী মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ৮ই রবিউল আউয়াল ১৪ই নববী সনে অর্থাৎ ১ম হিজরী সন মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিপ্রহরের সময় তিনি মদীনার উপকণ্ঠে (Upper Madina) 'কুবা' পল্লীতে পৌঁছান। সেখানে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার চারদিন অবস্থানের পর পঞ্চম দিন শুক্রবার বাতনে আদী নামক স্থানের বণি ছালেম পল্লীতে জুম'আর সালাত আদায় করেন।[৮] এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুম'আ।[৯] এখনো সেই উপত্যকায় মসজিদটি (মসজিদুল জুম'আ) রয়েছে।[১০] অতঃপর মদীনায় প্রবেশ করেন।[১১] মহানবী (সা.) মদীনার নাম রাখেন 'তাইয়্যেবা' বা পবিত্র ভূমি।[১২] মদীনার ইতিহাসে এমন সৌভাগ্যের দিন আর কখনও আসেনি আর কখনও আসবে না। সেখানে তাঁকে আনন্দঘন পরিবেশে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জনাকীর্ণ সংবর্ধনা সভায় মদীনাবাসী নবী করীম (সা.)-এর ঐতিহাসিক আগমনকে স্মৃতিবহ করে রাখার জন্য তাদের লালিত ইয়াসরীবের নামকরণ করেন 'মদীনাতুন্নবী' বা মদীনাতুর রাসূল'।[১৩] মদীনায় তখন মিশ্রিত বাসিন্দারা বসবাস করত।[১৪] তাদের মধ্যে ছিল- ১) মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়; ২) বিদেশী ইহুদী সম্প্রদায়; এবং ৩) নব দীক্ষিত মুসলিমগণ।[১৫]

গোত্রের বন্ধনই ছিল আরবদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। গোত্রই সরকার এবং গোত্র প্রধানই ছিল সরকার প্রধান।[১৬] যুদ্ধ-বিগ্রোহে বিপর্যস্ত আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আমন্ত্রণ ও অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমন করেন। আদর্শগত মতপার্থক্য ছাড়াও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত লেগেই থাকত। মহানবী (সা.) বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রয়াস পান। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ১২০ বছর যাবৎ চলা যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয়।[১৭] আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হয়। সূচিত হয় সমবেদনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অতুলনীয় জীবনধারা। রাসূলুল্লাহ (সা.) হয়ে ওঠেন সমাজের মধ্যমণি। কিন্তু মদীনার ইহুদী ও পৌত্তলিকদের দূরভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং মক্কার কুরাইশদের ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার, উৎপীড়ন, জুলুম, নির্যাতন, ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। মক্কার কুরাইশরা পত্র প্রেরণ ও নানাবিধ অপতৎপরতার মাধ্যমে মুনাফিক ও ইহূদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) মদীনা ও সেখানে বসবাসকারীদের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সকলকে একই উম্মাহ বা জাতি করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি (সা.) মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন।

মদীনার সনদ

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রের সাথে পর্যায়ক্রমে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। প্রথমে ২য় হিজরীর সফর মাসে মদীনা হতে ২৯ মাইল দূরবর্তী ওয়াদ্দান এলাকার বনু যামরাহ গোত্রের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। এরপর ২য় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বুওয়াত্ব সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। একই বছরের জুমাদাল আখেরাহ মাসে ইয়াম্বু ও মদীনার মধ্যবর্তী যুল-'উশায়রা এলাকার বনু মুদলিজ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তৃতীয় হিজরী সনে ইহূদী ও অন্যান্যদের মধ্যে মদীনার সনদ 'চুক্তিনামা' লিখে দিয়েছিলেন। মূলত ইহুদীরা তাদের নেতা কাব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডে ভীত হয়েই চুক্তিতে রাজী হয়েছিল। আর তা ছিল তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের পরের ঘটনা, যা পারস্পরিক সন্ধিচুক্তি।[১৮] হিজরতের পাঁচ মাস পর এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৯] মূলত চুক্তিনামা ছিল দু'টি। প্রথমটি ছিল ইহুদীদের সাথে মদীনায় আগমনের পর। আর দ্বিতীয়টি ছিল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের পর।'[২০] রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেন এবং তিনি ও তাদের মধ্যে একটি দলিল লিপিবদ্ধ করেন।[২১]' ঐতিহাসিকগণ দু'টি চুক্তি একত্রিত করেছেন।[২২] সনদের মূল ভাষা ছিল আরবী। তবে স্বাক্ষরকারীগণ নিজ নিজ ভাষায় স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা পক্ষগুলোর নিকট প্রেরণ করা হয়। মূল সনদটি বিশ্বের কোথাও সংরক্ষিত নেই। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। চুক্তির মধ্যদিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মদীনার সনদ ছিল একটি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক চুক্তি, যার

মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ স্বার্থে ও একক লক্ষ্যে একটি উম্মাহ বা জাতি গঠিত হয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'রাষ্ট্র' বলা হয়। এই সনদ ছিল আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম ভিত্তি।[২৩] সনদে বর্ণিত ধারার সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে হিশামসহ এক শ্রেণির ঐতিহাসিকের মতে, মদীনা সনদে ৫৩টি ধারা ছিল।[২৪] তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, সনদের ধারা ৪৭টি।[২৫]

চুক্তির ধারাসমূহ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'- আল্লাহর রাসূল নবী মুহুম্মদ (সা.) ও মুমিন-মুসলিম এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে এক লিখিত চুক্তি। যারা তাঁদের সাথে মিলিত হয়েছে তারা এর মধ্যে শামিল ও গণ্য। তাঁরা সকলে এক সম্প্রদায়, এক উম্মাহ।[২৬] একই বক্তব্য বারবার থাকায় অনুবাদে ৪-১১ ধারাগুলো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

> (১) এটি লিখিত হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর পক্ষ হতে মুমিন ও মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরায়শী ও ইয়াসরেবী এবং তাদের অনুগামী, যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে। (২) এরা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কুরায়েশ মুহাজিরগণ তাদের নিজ অবস্থায় থাকবে। তারা তাদের বন্দি বিনিময়ে মুমিনদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিদইয়া দিবে। একইভাবে (৪) বনু 'আওফ, (৫) বনু সায়েদাহ, (৬) বনুল হারেস, (৭) বনু জুশাম, (৮) বনু নাজ্জার, (৯) বনু 'আমর বিন 'আওফ, (১০) বনু নাবীত, (১১) বনু আউস সবাই স্ব স্ব পূর্বের অবস্থায় থাকবে এবং তাদের স্ব স্ব গোত্র ও শাখাসমূহ বন্দি বিনিময়ে মুমিনদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিদইয়া দিবে। (১২) মুমিনগণ তাদের মধ্যকার কোন ঋণগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত পরিবারকে ছেড়ে যাবে না, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে ফিদইয়া বা রক্তমূল্য না দেওয়া পর্যন্ত। কোন মুমিন কোন মুমিনের গোলামের সাথে কোনরূপ চুক্তি করবে না। (১৩) মুমিন-মুত্তাক্বীগণ তাদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহ করলে বা বড় কোন যুলুম করলে, পাপ করলে, শত্রুতা করলে কিংবা মুমিনদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে তার বিরোধিতা করবে এবং সকলে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। যদিও ঐ ব্যক্তি তাদের কোন একজনের সন্তান হয়। (১৪) কোন মুমিন কাফিরের বিনিময়ে কোন মুমিনকে হত্যা করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না। (১৫) আল্লাহর জিম্মা এক। তারা তাদের অধীনস্তদের আশ্রয় দিবে। আর মুমিনগণ একে অপরের বন্ধু অন্যদের থেকে। (১৬) যেসব ইহূদী আমাদের অনুসারী হবে তাদের জন্য থাকবে সাহায্য ও উত্তম আচরণ। তারা অত্যাচারিত হবে না এবং তাদের উপরে কেউ প্রতিশোধ নিতে পারবে না। (১৭) মুমিনদের সন্ধিচুক্তি একই। কোন মুমিন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময় মুমিন ব্যতিত অন্যের সাথে সন্ধি করবে না, নিজেদের মধ্যে সমভাবে বা ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যতিত। (১৮) প্রত্যেক যুদ্ধ যা আমাদের সাথে হবে, সেখানে একে অপরের পিছে আসবে। (১৯) মুমিনগণ একে অপরকে রক্ষা করবে, যখন আল্লাহর রাস্তায় তাদের রক্ত প্রবাহিত হবে। (২০) মুমিন-মুত্তাক্বীগণ সুন্দর ও সরল পথে থাকবে। কোন

মুশরিক কোন কুরায়েশ-এর জান ও মালের হেফাযত করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে বাধা হবে না। (২১) যদি কেউ কোন মুমিনকে বিনা দোষে হত্যা করে এবং তার প্রমাণ থাকে, তাহলে সে তার বদলা নেবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করে দেয় (রক্ত মূল্যের বিনিময়ে)। সকল মুমিন এ চুক্তির উপরে থাকবে। এর উপরে দৃঢ় থাকা ব্যতিত তাদের জন্য অন্য কিছু সিদ্ধ হবে না। (২২) আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী যে মুমিন এই চুক্তিতে স্বীকৃত হবে, তার জন্য সিদ্ধ হবে না কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়া। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে, কিয়ামতের দিন তার উপরে আল্লাহর লা'নত ও গযব থাকবে। তার থেকে কোনরূপ বিনিময় কবুল করা হবে না। (২৩) যখনই তোমরা এতে মতভেদ করবে, তখনই সেটা আল্লাহ ও মুহাম্মাদের দিকে ফিরে যাবে। (২৪) ইহূদীরা মুমিনদের সাথে খরচ বহন করবে, যতক্ষণ তারা একত্রে যুদ্ধ করবে। (২৫) বনু 'আওফের ইহূদীগণ মুসলমানদের সাথে একই জাতিরূপে গণ্য হবে। ইহূদীদের জন্য তাদের দ্বীন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের দ্বীন। এটা তাদের দাস-দাসীদের জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্য সমভাবে গণ্য হবে। একইভাবে বনু 'আওফ ব্যতিত অন্য ইহূদীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। তবে যে জুলুম করবে ও পাপ করবে, সে নিজেকে ও তার পরিবারকে ছাড়া কাউকে ধ্বংস করবে না। (২৬) আর বনু নাজ্জার, (২৭) বনুল হারেছ, (২৮) বনু সায়েদাহ, (২৯) বনু জুশাম, (৩০) বনুল আউস, (৩১) বনু ছা'লাবাহর ইহূদীদের জন্য ঐরূপ চুক্তি যেরূপ থাকবে বনু 'আওফের ইহূদীদের জন্য। তবে যে ব্যক্তি জুলুম করবে ও পাপ করবে, সে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ছাড়া কাউকে ধ্বংস করবে না। (৩২) ছা'লাবাহর জাফনাহ গোত্রটি তাদের মতই গণ্য হবে। (৩৩) বনু শুত্বাঈবাহর জন্য বনু 'আওফের ইহূদীদের মতই চুক্তি থাকবে। কেবল সদ্ব্যবহার থাকবে, অন্যায় নয়। (৩৪) ছা'লাবাহর দাস-দাসীগণ তাদের মতই গণ্য হবে। (৩৫) ইহূদীদের মিত্রগণ ইহূদীদের মতই গণ্য হবে। (৩৬) মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুমতি ব্যতিত তাদের কেউ বাইরে যেতে পারবে না। কোন যখমের বদলা নিতে বিরত থাকবে না। যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, সে তার নিজের উপর ও নিজ পরিবারের উপর বাড়াবাড়ি করে। তবে যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ তার ব্যাপারে খুশী থাকেন। (৩৭) ইহূদীদের উপর তাদের ব্যয় এবং মুসলমানদের উপর তাদের ব্যয়। যারা এই চুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে। তারা পরস্পরের প্রতি সুধারণা রাখবে, উপদেশ দিবে ও সদাচরণ করবে। অন্যায় করবে না। মিত্রের অন্যায়ের কারণে ব্যক্তি দায়ী হবে না। মজলুমকে সাহায্য করা হবে। (৩৮-পুনরুক্ত) ইহূদীরা মুমিনদের সাথে খরচ বহন করবে, যতক্ষণ তারা একত্রে যুদ্ধ করবে (এটিতে ধারা ২৪-এর পুনরুক্তি হয়েছে)। (৩৯) চুক্তিভুক্ত সকলের জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরভাগ হারাম অর্থাৎ নিরাপদ এলাকা হিসাবে গণ্য হবে। (৪০) প্রতিবেশীগণ চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ন্যায় গণ্য হবে। যদি সে ক্ষতিকারী ও অন্যায়কারী না হয়। (৪১) কোন নারীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, তার

পরিবারের অনুমতি ব্যতিত। (৪২) চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যে কোন সমস্যা ও ঝগড়ার সৃষ্টি হলে এবং তাতে বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকটে পেশ করা হবে। এই চুক্তিনামায় যা আছে, আল্লাহ তার উপর সর্বাধিক সতর্কতা ও সন্তুষ্টিতে আছেন। (৪৩) কুরায়েশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেওয়া হবে না। (৪৪) ইয়াসরিবের উপরে কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। (৪৫) যখন তারা কোন সন্ধির দিকে আহুত হবে, যেখানে তারা পরস্পরে মীমাংসা করবে ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তা কবুল করবে, তারা সেটাতে সাড়া দিবে। মুমিনদের উপর এটা প্রযোজ্য হবে। তবে যারা ধর্মের কারণে যুদ্ধ করে, তাদের উপর নয়। প্রত্যেকের জন্য তার নিজ পক্ষের অংশ নির্ধারিত হবে। (৪৬) আউসের (মিত্র) ইহূদীদের নিজেদের ও তাদের দাস-দাসীদের উপর অনুরূপ প্রযোজ্য হবে, যেরূপ অত্র চুক্তিকারীদের উপর প্রযোজ্য হবে। (আর তা হলো) স্রেফ সদাচরণ এই চুক্তিকারীদের পক্ষ হতে। (৪৭) কোন অত্যাচারী ও পাপীর জন্য এ চুক্তিনামা কোনরূপ সহায়ক হবে না। যে ব্যক্তি বের হয়ে যাবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি বসে থাকবে, সে ও মদীনায় নিরাপদ থাকবে। ঐ ব্যক্তি ব্যতিত যে জুলুম ও অন্যায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সাথী, যে সদাচরণ করে ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে। আর মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম’।[২৭]

সাংবিধানিক দলিল

মদীনার সনদ একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কীর্তি। মুহাম্মদ (সা.) মদীনা সনদের মাধ্যমে এক ধরনের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেন, যেখানে প্রত্যেকটি গোত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথা নিয়মে নির্দিষ্ট করা ছিল।[২৮] সনদটিকে সংবিধান এবং চুক্তি দু’টিই বলা যায়। কারণ এটি এমন একটি চুক্তি যা মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি তৈরি করে। চুক্তিটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করায় তা একটি সাংবিধানিক দলিল। তাছাড়া সনদটি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কাঠামো প্রস্তুত করে, যা একটি সংবিধানের মূল কাজ। পার্থিব ও ধর্মীয় বিধানের সমন্বয় হওয়ায় তা পৃথিবীর পূর্বাপর সব সংবিধানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। সনদটি সর্বকালের সব দেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের জন্য একটি আদর্শ। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হয়। অথচ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে প্রণয়নকৃত মদীনার সনদ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছিল। আধুনিক বিশ্বের কোন দেশের সংবিধান হুবহু মদীনা সনদের অনুরূপ না হলেও এর বিভিন্ন ধারণা পরবর্তীতে সাংবিধানিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলেছে। মূলত আধুনিক সাংবিধানিক ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেছিল মদীনার সনদ। সুতরাং বলা যায়, মদীনার সনদ একটি কার্যকর সংবিধান।

সনদের প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ (সা.)-এর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘মদীনা সনদ’ প্রণয়নে। গৃহযুদ্ধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত মদীনাবাসীদের বেদনাদায়ক ও ধ্বংসাত্মক

পরিবেশকে নব আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য মহানবী (সা.) সন্ধি চুক্তি করেন। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৯] সমকালীন প্রেক্ষাপটে এ সনদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বিবিধ। যেমন, মদীনাকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা; দ্বিধাবিভক্ত মদীনাবাসীদের মধ্যে সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নয়ন করা; জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা; মদীনায় বসবাসরত মুহাজিরদের বাসস্থান ও জীবিকা উপার্জনের সুব্যবস্থা করা; সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সম্প্রপ্রীতির বন্ধন গড়ে তোলা; জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; যুদ্ধ-বিগ্রোহের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা; ধর্ম প্রচার ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র

অসাম্প্রদায়িক বলতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমান ব্যবহার ও ন্যায়বিচার বুঝায়। যে রাষ্ট্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে তাকে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বলা যায়। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। রাষ্ট্র প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। মানবজাতি একই উৎস হতে সৃষ্ট।[৩০] আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে। তাদের মধ্যে জাতি বা গোত্রগত ভেদাভেদ থাকবে না। এটাই অসাম্প্রদায়িকতার মূলভিত্তি।

মদীনা সনদের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র

মদীনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের আদর্শ মডেল বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। যেমন-

সার্বভৌমত্ব

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিল মদীনা রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র।[৩১] পবিত্র *কোরানে* ঘোষণা করা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য’।[৩২] অন্যত্র বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কারো আদেশ বা আধিপত্য নাই’।[৩৩] আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে অর্পিত হবে তারা হবেন আল্লাহ্‌র আইনের অধীন। রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) সার্বিক কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তবে সেই কর্তৃত্ব সার্বভৌম আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। মূলত মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহই ছিলেন আইনত সার্বভৌম এবং মহানবী (সা.) ছিলেন কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আল্লাহর আইন বিধান অনুসরণ ও কার্যকর করার মাধ্যমেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত করেছেন।

পরামর্শ ভিত্তিক

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) অভিজ্ঞ সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরামর্শের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ

তা'আলা পবিত্র কুরআনে পরাশর্ম ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের নির্দেশনা দিয়েছেন।[৩৪] বলা হয়েছে, 'আর জরুরি বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর'।[৩৫] ওমর (রা.) ৫৮৪-৬৪৪) বলতেন, 'পরামর্শ ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না।'[৩৬]

নতুন জাতীয়তা

'সকল মানুষের সমান অধিকার' সাম্যের এই মহান বাণীর বাস্তব প্রতিফল দেখা যায় মদীনা রাষ্ট্রে। বংশ, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল প্রভৃতি আরবের চিরায়ত বন্ধন ছিন্ন করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক নতুন এক জাতীয়তার শুভ সূচনা হয়, যা পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও সমানাধিকার ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই সমকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে টপকে রাষ্ট্রটি অপরাজেয় বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রোহ, রক্তপাত বন্ধ করতে সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। সকল শ্রেণির মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে শান্তিপূর্ণ মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অঞ্চল ভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বিশ্ব জাতীয়তার নবযাত্রা শুরু হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ স্বীকৃত হয়। শাসন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের দাসত্বের অবসান ঘটে।

ন্যায়বিচার

মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার মানবতাকে সমুন্নত করে। বিচারের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীভূত হয়েছিল। রাজা-প্রজা, ছোট-বড়, ধনী-গরীব, মুসলমান-অমুসলমান, আরব -অনারব, আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ ছিল না। নবী করিম (সা.) বলেন, 'মানুষ চিরুনির কাঁটাগুলির মতই সমান'।[৩৭] পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮] রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী (স.) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ইসলামী রীতি-নীতিতে অভিজ্ঞ, সৎ, আল্লাহভীরু ও ন্যায়বান ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক ও কাজীপদে নিযুক্ত করতেন। মাখযূমিয়া চুরি করে অপরাধী সাব্যস্ত হলে দণ্ড মওকূফের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর নিকট সুপারিশ করলে তিনি তা নাকচ করে দেন।[৩৯] ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য কামনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।[৪০] মহানবী (সা.) নিজেই একদা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলে, 'আমার নিকট কারোর কিছু প্রাপ্য থাকলে তা যেন সে চেয়ে নেয়, কারো উপর অবিচার করে থাকলে সে যেন তার প্রতিশোধ আমার উপর নিয়ে নেয়।'[৪১] ইংল্যাণ্ডে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের আইন বাতিল হলে নরহত্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। এমন পরিস্থিতিতে ইলেন হার্বাট মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহালের দাবি করেছিলেন।[৪২]

মদীনা রাষ্ট্রে কারও জন্য কোন সুযোগ সুবিধা সংরক্ষিত ছিল না। পরবর্তীতেও রাষ্ট্রে তা অনুসৃত হয়েছে। সমতার ভিত্তিতে বায়তুল মালের সম্পদ বিতরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে খলীফা ওমর (রা.)-কে জুম্মার খুৎবার সময় প্রকাশ্যে জবাবদিহি করতে

হয়েছিল।[৪৩] ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা দেশে শান্তি চাও, তাহলে ওমরের শাসনব্যবস্থা কায়েম কর।[৪৪] রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও আলী (রা.)-কে একজন সাধারণ নাগরিকের মত ন্যায়বিচারের প্রার্থী হিসেবে কাজীর দরবারে উপস্থিত হতে হয়েছিল।[৪৫] অথচ আধুনিক বিশ্বের বহু দেশে সাংবিধানিকভাবে বিচারের তারতম্য রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতিকে আদালতে জবাবদিহি করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।[৪৬] আবার সংসদ সদস্যদের জন্য করমুক্ত কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়েছে।[৪৭] অন্যদিকে ইংল্যান্ডের সাংবিধানিক নীতি অনুযায়ী 'রাজা কোন অপরাধ করতে পারেন না' (The King can do no wrong) বলে স্বীকৃত, যা সার্বভৌম অনাক্রম্যতা (Sovereign Immunity) নামে পরিচিত।[৪৮] কিন্তু মদীনা রাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল।[৪৯] আইনের চোখে রাজা-প্রজা সকলেই ছিলেন সমান।

বর্ণ-বৈষম্যের অবসান

রাষ্ট্রে বর্ণবাদের কোন স্থান ছিল না। মদীনা সনদের মাধ্যমে বর্ণবৈষম্যের মূলোৎপাটন করে শান্তিপূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত জগৎবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন মহানবী (সা.)। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন বর্ণের ভিন্নতা ও ভাষাগত বিভাজন মহান সৃষ্টিকর্তার অন্যতম নিদর্শন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, 'তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশমালা ও যমীনের সৃষ্টিও-রয়েছে তোমাদের পারস্পরিক ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র; অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে রয়েছে এতে বহু নিদর্শন।[৫০] গাত্র বর্ণ, শক্তি কিংবা বংশ কোনটিই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। মানবজাতির উৎস ও শ্রেষ্ঠত্বের মৌলিক ঘোষণা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই পরহেজগারী ব্যতীত।[৫১] কিসমিসের ন্যায় মাথা বিশিষ্ট হাবশী গোলামও শাসক নিযুক্ত হলে তার আনুগত্য করতে রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।[৫২] আল্লাহ প্রদত্ত বিধানে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই।[৫৩] রক্তের সম্পর্কের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা আরবের ইতিহাসে এই প্রথম।[৫৪]

অমুসলিম নাগরিকদের অবস্থা

মদীনা রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ পরিপূর্ণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। যে কারণে তারা স্ব-ধর্মীয় শাসকদের অধীনে জীবন যাপনের চেয়ে মুসলিম শাসনাধীনে বসবাসে বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের উপর আক্রমনের উদ্দেশ্যে ইয়ারমুক-এর দিকে অগ্রসর হলে হিমস-এর অমুসলিম অধিবাসীরা বলেন, 'পূর্বে আমাদের স্ব-ধর্মীয় লোকদের শাসনাধীনে যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলাম তার তুলনায় তোমাদের শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকা আমাদের নিকট অধিক শ্রেয় ও প্রিয়। আমরা তোমাদের

সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে হিরাক্লিয়াসের মুকাবিলা করব এবং হিমস যাতে সে দখল করতে না পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'[৫৫]

মদীনা রাষ্ট্রে ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ সম্মানের সাথে ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করে।'[৫৬] নিকৃষ্টতম পৌত্তলিকতার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়া জাতিকে রাসূল (সা.) শিখিয়েছিলেন পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্ম-সংযম, উদারতা ও দেশপ্রেম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জেনে রেখ! কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করে, কোন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তার কোন ধনসম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় আমি তার বিপক্ষে অমুসলিমের পক্ষে অবস্থান নেব।[৫৭] তিনি অন্যত্র বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, যে জান্নাতের কোন গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ চছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।[৫৮] ইংল্যান্ডের বিখ্যাত আইরিশ দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০) মহানবী (সা.)-কে 'সেভিয়ার অব হিউম্যানিটি' বা 'মানবতার ত্রাণকর্তা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর মত একজন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক শাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এমনভাবে করতে সক্ষম হতেন, যা সেই অতি কাংখিত সুখ ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসত।'[৫৯] মাইকেল এইচ হার্ট (১৯৩২-২০১১) যথার্থই বলেছেন, *'He was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels.'*[৬০]

দাস-দাসীর অধিকার

মদীনা রাষ্ট্রে দাস-দাসীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করা হয়। মহানবী (সা.) নিজেই দাস প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে তার প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিবেন।[৬১] আনাস (রা.) বলেন, 'আমি দশ বছর রাসূল (সা.) এর দেখমত করেছি। আমার সব কর্ম তিনি যেভাবে চাইতেন সেভাবে করতে পারতাম না। তা সত্ত্বেও তিনি কখনও আমাকে সামান্যতম কষ্ট দিয়ে কথা বলেননি যে, কেন এটা করেছ এবং কেন এটা করনি?।[৬২] মনিবদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের অধীনস্তদের তাই খেতে দাও, যা তোমরা খাও। তাদেরকে তাই পরিধান করাও, যা তোমরা পরিধান কর। তাদের এমন দায়িত্ব দিয়ো না যা তাদেরকে অপারগ করে দেয়। যদি তাদেরকে কোন কষ্টকর কাজ দাও, তাহলে তোমরা তাদেরকে সহযোগিতা কর।[৬৩]

নারীর অধিকার

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং অধিকার বঞ্চিত ছিল। নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং পণ্য হিসেবে গণ্য করা হত। তাদেরকে জীবন্ত

কবর দেওয়া, দেব-দেবির নামে বলি দেওয়া, সহমরণের জন্য স্বামীর চিতায় জোর করে তুলে দেওয়া, শয়তানের ক্রীড়ানক বা বংশধর ভাবা হত।[৬৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?'।[৬৫] মদীনা রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অবস্থান ও অধিকার সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়।[৬৬] নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে তাদেরকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।[৬৭] আল কুরআনের ঘোষণা 'পুরুষের জন্য পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তিতে যেমন অংশ আছে, নারীর জন্যও পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। তা অল্পই হোক বা বেশী, এক নির্ধারিত অংশ।'[৬৮]

ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতা

মদীনা রাষ্ট্রে সকল ধর্মের অধিকার সুরক্ষিত ছিল। রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ একই ধরনের আইন (Law of the land) দ্বারা শাসিত হবে। আর এটাই ছিল আইনের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম স্বকীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে কখনও জোর করে কারো উপর চাপিয়ে দেয় না এবং এই প্রকার জবরদস্তির নীতিও কখনও সমর্থন করে না। আধুনিক বিশ্বে মানুষের বাক স্বাধীনতা লংঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান ৫৭ ধারা, ১৪৪ ধারা, ১৫৭ ধারা, আইসিটি-আইন-২০১৩, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা-২০২০ প্রভৃতি জনগণের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করছে। মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বশান্তি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামী জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত আইনবিদ এ. কে. ব্রোহী (১৯১৫-১৯৮৭), বিশ্বনন্দিত বিচারপতি জাস্টিস কায়ানী (১৮ অক্টোবর ১৯০২-১৫ নভেম্বর ১৯৬২), জাস্টিস মুরশেদ (১১ জানুয়ারি ১৯১১-৩ এপ্রিল ১৯৭৯), জ্ঞানতাপস ড. মু. শহীদুল্লাহ (১০ জুলাই ১৮৮৫-১৩ জুলাই ১৯৬৯) প্রমুখ।[৬৯]

ধর্মের ব্যাপারে রাসূল (সা.) কখনও কাউকে চাপ প্রয়োগ করেন নি। একজন ইহুদী বালক দীর্ঘদিন রাসূল (সা.) এর সেবাযত্ন করার পরও তিনি তাকে ও তার পরিবারকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করেননি।[৭০] টমাস কার্লাইল তাঁর সুবিখ্যাত '*হিরোজ এ্যান্ড হিরো ওয়ারশীপ*' ও '*দি হিরো এ্যাজ প্রোফেট*' বক্তৃতামালায় প্রমাণ করেছেন ইস্পাতের তলোয়ারে নয় বরং বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তির তলোয়ারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল।[৭১] টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড তাঁর বিখ্যাত '*The Preaching of Islam*'গ্রন্থে সেই অনুপুংখ বিবরণ দিয়েছেন।[৭২] ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কোন সুযোগ নেই। আল-কুরআনের ঘোষণা, '(আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই, (কেননা) সত্য মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে।'[৭৩] খলিফা ওমর (রা.)-এর নিকটে খৃষ্টান বিশ্ব আত্মসমর্পণ করেছিল। এমনকি ফিলিস্তিনের খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত, তখনও তিনি এক দুর্বল বৃদ্ধাকে ইসলাম কবুলের জন্য কোন প্রকার চাপ দেননি।[৭৪] এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত মদীনা রাষ্ট্রের পরতে পরতে রয়েছে।

মদীনার সনদের প্রভাব

একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ড, জনগোষ্ঠী, সার্বভৌম সরকার এবং জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ প্রয়োজন হয়। কিন্তু মদীনায় কোন সরকার ছিল না। তাছাড়া জনগণের মধ্যে একাত্মবোধেরও চরম অভাব ছিল। মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক মদীনার সনদ প্রণয়নের ফলে তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সনদের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের লিখিত রূপরেখা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়। ইসলাম আরবের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়।[৭৫]

মদীনা পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রক্তপাত, হানাহারি, সংঘাত নিষিদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। জাতিগত শাস্তি রহিত হয়ে সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শরনার্থীরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সমান মর্যাদা লাভ করে। সনদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অতুলনীয় বিচক্ষণতা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সম্ভবত আজ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যতগুলো সংবিধান প্রণীত হয়েছে, সব সংবিধানেই মদীনা সনদের দফাগুলো অনুসরণ করা হয়েছে। মানুষ শত শত বছরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে মদীনার সনদ নামক অঙ্গীকারনামায় তা লিখিয়ে নিয়েছিলেন।[৭৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের পরিধি মদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি সম্প্রসারিত হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেদুইন গোত্রের প্রতিনিধিরা মদীনায় এসে মুহম্মদ (স.)-এর শাসন কর্তৃত্বকে স্বীকার করে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ওমান, ইয়েমন ও হাজরামাউত থেকে প্রতিনিধিরা মদীনায় এসে মুহম্মদ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। রাসূল (সা.)ও তৎকালীন আরব ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্র প্রধান ও গোত্র প্রধানদের নিকট ইসলাম ও পরকালীন পুরস্কারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে পত্র প্রেরণ করেন। দেহিইয়া বিন খলীফা কালবীকে রোম সম্রাট কায়ছারের নিকট, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট, হাতেম বিন আবু বালতা'আহ লাখমীকে মিসর রাজ মুকাউকিস-এর নিকট, সালীত বিন আমর আল আমেরীকে ইয়ামামার শাসক হাওযাহ বিন আলী হানাফীর নিকট, শুজা বিন ওয়াহাব আল আসাদীকে বালকা (দামেশক)-এর শাসক হারেজ বিন আবু শিমর আল-গাসসানীর নিকট এবং বাহরায়েনের শাসক মুনযির বিন সাবওয়ার নিকট পত্রসহ পাঠিয়েছিলেন।[৭৭] তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী পত্রের শেষে সীলমোহর ব্যবহার করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আংটিতে মুদ্রিত সীলমোহরটি ছিল রৌপ্য নির্মিত, যাতে 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ খোদিত ছিল। এতে তিনটি লাইন ছিল। এক লাইনে 'মুহাম্মাদ', এক লাইনে 'রাসূল' এবং এক লাইনে 'আল্লাহ'।[৭৮]

অন্যদিকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকাস, ওমানের শাসকবর্গ ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীসহ তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর রাজন্যবর্গ মহানবী (সা.)-এর দরবারে সম্মানসূচক উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন।[৭৯] রাসূলুল্লাহ (সা.)

নিজে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন, হাজরামাউত, ইয়ামেন এবং সমগ্র আরব উপত্যকা বিজয় করেন। হিজরের অগ্নি উপাসক ও দক্ষিণ সিরিয়ার মুতাসহ কতিপয় অঞ্চল থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হয়। আকাবা উপসাগরের নিকটবর্তী স্থানের খৃষ্টান 'আয়লা' সম্প্রদায়ের প্রধান শাসনকর্তা যুহান্না ইবনু রুবা মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে বাৎসরিক ৩০০ দিনার জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হন। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। যদি সরকার বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে জিজিয়া করের সমুদয় অর্থ ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।[৮০] মহানবী (সা.) মদীনায় আগমনের মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে আরবজাতির চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত দল ও গোত্রসমূহের মধ্যে এক মহান আদর্শের প্রভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাফল্য অর্জন ইতিহাসে নজীর হিসেবে চির অম্লান থাকবে।[৮১]

মদীনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল, শান্তিবাদী শাসন ব্যবস্থার প্রতি মানুষের গভীর আস্থা সৃষ্টি হয়।[৮২] মদীনার সনদে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইংল্যাণ্ডে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে Magna Carta, ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে Petition of Right, ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে Habeas Corpus Act; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে United States Bill of Rights এবং জাতিসংঘে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে Universal Declaration of Human Rights ঘোষিত হয়।[৮৩] মদীনার সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর বিশ্বজনীনতা প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত কর্মপন্থা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। মহানবী (সা.)-এর আদর্শ তাঁর রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তিনি মহান আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।[৮৪] 'মুহাম্মদ (সা.)-এর চিন্তা ও কাজের মধ্যে মিল ছিল এবং এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থা। তিনি একদিকে ছিলেন আল্লাহর রাসূল, অন্যদিকে ছিলেন আইন প্রণেতা (Lawmaker) ও ম্যাজিস্ট্রেট (Magistrate)।[৮৫]

উপসংহার

মুহাম্মাদ (সা.) হিজরতের পর মাত্র দশ বছর (৬২২-৬৩২) মদীনায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু মদীনা তাঁর জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়। মদীনার সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বংশীয়, ধর্মীয়, গোত্রীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। মদীনা সনদের দ্বারা রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অনুসরণের মাধ্যমে আজও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা সম্ভব। মূলত মদীনা সনদেই নিহিত ছিল অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপরেখা।[৮৬]

তথ্যসূত্র

১. ‘ইয়াসরীব’শব্দের ‘ছা’ ধ্বনির উচ্চারণে আরবগণ ‘থ’ এবং অনারবগণ ‘স’ উচ্চারণ করত (সূত্রঃ স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদক-ড. রশীদুল আলম (ঢাকাঃ এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ১১৬)।

২. P, K, Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan and Co Ltd, 1958), p. 104.

৩. আল কুরআনে ‘মদীনা’ নামটি চারবার এসেছে (আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত ১১১ ও ১২০; আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ৬০; আল কুরআন, সূরা মুনাফিকূন, আয়াত ৮।

৪. শেখ লুৎফর রহমান, আরব জাতির ইতিহাস (ঢাকাঃ মৌলি প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২), পৃ. ৬১।

৫. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, সারওয়ার-ই-কায়েনাত মুহাম্মদ (সা.) (ঢাকাঃ নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২০), পৃ. ৭৪।

৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, (ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, নবম মুদ্রণ, ২০১২), পৃ. ৩৭৯।

৭. মাইকেল এইচ. হার্ট, বিশ্বের সেরা মনীষীদের জীবনী, মেহেরুননেছা তানিয়া অনূদিত (ঢাকাঃ সালাউদ্দিন বইঘর, ২০২১), পৃ. ১৫।

৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।

৯. আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহইয়া বালাযুরী (র.), ফুতূহুল বুলদান, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৮), পৃ. ৪।

১০. শাইখ মতীউর রহমান, নবী চরিত (রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার, ২০২১), পৃ. ৪৮।

১১. সফিউর রহমান মোবারকপুরী (র.), আর রাহীকুল মাখতূম, আব্দুল খালেক অনূদিত (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ২১১, ২১৬।

১২. আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহইয়া বালাযুরী (র.), ফুতূহুল বুলদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১৩. কে. এস. সিদ্দিকী, *ঐতিহাসিক মদীনার সনদ*, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ মার্চ, ২০১৮।

১৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫), পৃ. ৩৩১।

১৫. সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রঃ), আর রাহীকুল মাখতূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকা : ১৯৪২), পৃ. ১৪৭।

১৬. আবদুল করিম, কিতাবুর রসূল, আব্দুল করিম সম্পাদিত (ঢাকা : ইসলামী ঐতিহ্য, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জুন ১৯৮৫), পৃ ১।

১৭. আউস ও খাযরাজ ছিলেন আপন দুই ভাই এবং ইসমাঈল পুত্র নাবেত-এর বংশধর (মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

১৮. তদেব, পৃ. ৩৩৪।

১৯. ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, মহানবীর জীবনপ্রবাহ (রাজশাহীঃ শাহপীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৯), পৃ. ৩৩৫।

২০. ডক্টর আকরাম যিয়া উমারী, সীরাহ নববিইয়াহ সহীহাহ (রিয়াদঃ মাকতাবা উবাইকান, ২০০৯), পৃ. ২৮১।

২১. যাদুল মা'আদ (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুল রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ. ৫৮।

২২. তদেব, পৃ. ৫৮।

২৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

২৪. Wikipedia, https://bn.wikipedia.org › wiki ›;সৈয়দ এ. এফ. এম মঞ্জুর-এ-খোদা, মদীনা সনদঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) রাষ্ট্রচিন্তা ও আজকের বিশ্ব,যুগান্তর, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫।

২৫. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, সারওয়ার-ই-কায়েনাত মুহাম্মদ (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, আস সীরাতুন নববীয়া (স) (ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১৫২।

২৬. ইবনে ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ৩য় খণ্ড, শহীদ আখন্দ অনূদিত (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯২), পৃ. ২০; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৩৫; শেখ লুৎফর রহমান, আরব জাতির ইতিহাস (ঢাকাঃ মৌলি প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২), পৃ. ৬১।

২৭. ইবনু হিশাম, আস সীরাতুন নববিইয়াহ, তাহকীক : মুসতফা সাকা ও অন্যান্য বৈরুত : দারুল মাআরিফাহ, তাবি), পৃ. ৫০১-০৪; ডক্টর আকরাম যিয়া উমারী, সীরাহ নববিইয়াহ সহীহাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৫।

২৮. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina,* (London: Oxford University Press, Amen House, 1953) p. 221.

২৯. আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ৭২।

৩০. আল কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩; সূরা নিসা, আয়াত ১।

৩১. আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত ২৬।

৩২. আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০।

৩৩. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১৮৯।

৩৪. আল কুরআন, সূরা আশ শূরা, আয়াত ৩৮; আল ইমরান, আয়াত ১৫১।।

৩৫. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯।

৩৬. সুনানে কুবরা, হাদীস ৭১৫৪; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হাদীস ৩৮১৯৭।

৩৭. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২৬৩।

৩৮. আল কুরআন, সূরা আশ শূরা, আয়াত ১৫; আরাফ, আয়াত ২৭; নাহল, আয়াত ৯০।

৩৯. বুখারী, হাদীস নং ৬৭৮৭; মুসলিম, হাদীস নং ৪৩০২, আবূদাঊদ, হাদীস নং-৪৩৭৩।

৪০. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৫৮।

৪১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার প্রাগুক্ত, ২৬২।

৪২. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকাঃ ইফাবা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ. ৬৬।

৪৩. আইয়ামে খিলাফতে রাশেদাহ, পৃ. ১০৩-১০৪।

৪৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, মাসিক আত তাহরীক, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৫

৪৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হাদীস ২০২৫২; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১০/৩৬।

৪৬. অনুচ্ছেদ ৫১(১) (২)।

৪৭. আয়কর আইন ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), ২২ জুন ২০২৩। চাকরির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন অংশ ৭ (প্রথম অধ্যায়)।

৪৮. William Blackstone 1723–80

English jurist, that the king can do no wrong, is a necessary and fundamental principle of the English constitution.*Commentaries on the Laws of England* (1765) bk. 3, ch. 17 (Oxford Essential Quotations (6 ed.), Edited by: Susan Ratcliffe, Publisher : Oxford University Press Published online: 2018 Current Online Version: 2018, ISBN: 9780191866692

৪৯. Abdur Noor, Social Justice in Bangladesh (Chittagong: Liberty Forum, April 1991), p. 24

৫০. আল কুরআন, সূরা আর রূম, আয়াত ২২।

৫১. তিরমিযি, হাদীস নং-৩২৭০।

৫২. বুখারী, হাদীস নং-৭১৪২; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-২৮৬০, আহমদ, হাদীস নং-১২১২৬।

৫৩. মাসুমেহ রাগেবি বায়াত, ইসলাম ও ইসলামপূর্ব যুগে বাঙালী সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩), পৃ. ৭।

৫৪. Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs, Revised: 10th Edition*, Palgrave Macmillan; (September 6, 2002) ISBN 0-333-63142-0

৫৫. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, রাষ্ট্র ও সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

৫৬. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম এ্যান্ড এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য স্যারাসিনস, গ্রন্থাধ্যক মাশহুদ হাসয়ান (ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ১০৩-১০৪।

৫৭. আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৩৯৭২।

৫৮. সহীহ বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী- হাদীস ৬৪৩৪, ইফাবা- হাদীস ৬৪৪৬।

৫৯. Sir George Bernard Shaw in ‘The Genuine Islam,’ vol. 1, no. 8, 1936.

৬০. Michael. H. Hart, *The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in the History* (New York : Hart Publising , 1978), p.33

৬১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং- ৩৩৮২।

৬২. আবুদাউদ, হাদীস নং-৪৭৭৪।

৬৩. ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৩৬৯০।

৬৪. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ), (কলকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, দ্বিতীয় ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ১২৮।

৬৫. আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত ৮-৯।

৬৬. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১।

৬৭. আল কুরআন, সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮; মুসলিম হাদীস ১২১৮; বিদায় হজ্জ অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হাদীস ২৫৫৫ ‘মানাসিক অধ্যায়; ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩০৭৪।

৬৮. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৭।

৬৯. Allahbukhsh K. Brohi, "Human Rights and Duties in Islam: A Philosophic Approach," in Islam and Contemporary Society, ed. Salem Azzam (London: Longman Group Ltd., 1982), pp. 233–235; Allahbukhsh K. Brohi, "Islam and Human Rights," Pakistan Law Decisions (PLD) Lahore 28 (1976), pp. 150–152.

৭০. বুখারী হাদীস নং-১৩৫৬; আবু দাঊদ হাদীস নং-৩০৯৫; আহমাদ হাদীস নং-১৩৩৯৯; মিশকাত হাদীস নং-১৫৭৪।

৭১. Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (London: Chapman and Hall, 1840), pp. 61–62.

৭২. টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড, *দি প্রিচিং অব ইসলাম*, মোঃ সিরাজ মান্নান ও ইব্রাহীম ভূঁইয়া অনূদিত (ঢাকা: ইফাবা, ২০১২), পৃ. ১০।

৭৩. আল কুরআন, সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৫৬।

৭৪. বায়হাক্বী হাদীস ১২৮ 'তাহারৎ' অধ্যায় ১/৩২ পৃ.; দারাকুৎনী হদীস ৬০-৬১; কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৫৬; আল-বিদায়াহ ৭/৫৬।

৭৫. পি. কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিকথা, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ অনূদিত (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ১৯।

৭৬. ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী, সিরাতুন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নুরুজ্জামান নাহিদ ও অন্যান্য অনূদিত (ঢাকা: কালান্তর প্রকাশনী, ২০২২), পৃ. ৭৯।

৭৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭।

৭৮. বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭২-৭৩ 'আংটি খোদাই' অনুচ্ছেদ; বুখারী, হাদীস নং ৩১০৬, ৫৮৭৮; মিশকাত, হাদীস নং ৪৩৮৬।

৭৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন* (রাজশাহী : হাদীস ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৪।

৮০. মুহাম্মাদ কুতুব, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট, ২০০৫), পৃ. ৯৩।

৮১. Muhammad Al Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective* (London: KP1, 1985, p.243.

৮২. Alfred Guillaume, *The Life of Muhammad, A Translation of IBN Ishq's Sirat Rasul Allah (*London: Oxford University Press, 1955), 627.

৮৩. সৈয়দ এ. এফ. এম. মঞ্জুর-এ-খোদা, *মদীনা সনদ: রাসূলুল্লাহর (সা.) রাষ্ট্রচিন্তা ও আজকের বিশ্ব*, *দৈনিক যুগান্তর*, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫।

৮৪. আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ২১।

৮৫. Muhammad Al Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective* (London: KP1, 1985), p.243.

৮৬. Reuben Levy, The Social Structure of Islam (London : Cambridge University Press, 1979), p. 275.